পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফিরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ্ প্রান্তরে ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খৃস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত اَلَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহ্র তফসীর অনুযায়ী উল্লেখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। واللّٰه اعلم

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ـ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

—পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আ)-রও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ—আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আ)-র চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় আমাদের রসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا —চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলেছিলেনঃ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي —আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ্ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রসূলের সাথে আল্লাহ্র সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَ

الَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ
الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ
لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾
وَاغْفِرْ لِأَبِيْٓ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ
لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ
أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾
فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَهُمْ
فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

(৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর? (৭১) তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। (৭২) ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে কিংবা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি তারা এরূপই করত। (৭৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু, (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর

তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) যিনি আমাকে আহার দেন এবং পানীয় দান করেন, (৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর (৮৫) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, (৮৮) যে দিবসে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, (৮৯) কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। (৯০) জান্নাত আল্লাহ্‌ভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে। (৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, (৯৭) আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্কর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম! (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে, এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণাদি জানতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত প্রমাণাদি। কেননা, আরবের এই মুশরিকরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবি করে। এই বৃত্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর (প্রতিমাপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি (অলীক) বস্তুর পূজা কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের পূজা করি এবং তাদের (পূজা)-কেই আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন (তোমাদের অভাব-অনটন দূর করার জন্য) তাদেরকে আহবান কর, তখন তারা শোনে কি অথবা (তোমরা যে তাদের পূজা কর,) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করে কিংবা (যদি তোমরা তাদের পূজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে? (অর্থাৎ

পূজনীয় হওয়ার জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জরুরী। তারা বলল, (তা তো নয়। তারা কিছুই শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পূজা করার কারণ এটা নয়,) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (তাই আমরাও এই পূজা করি)। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি তাদের (অবস্থা) সম্পর্কে ভেবে দেখেছ; যাদের পূজা করতে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা? তারা (উপাস্যরা) আমার (অর্থাৎ তোমাদের) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পূজা করলে; আমি করি কিংবা তোমরা কর। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই।) কিন্তু হ্যাঁ, বিশ্বপালনকর্তা (এমন যে, তিনি তাঁর উপাসনাকারীদের বন্ধু। তাঁর ইবাদত আদ্যোপান্ত উপকারী।) যিনি আমাকে (এমনিভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি দান করেন, যদ্দ্বারা লাভ-লোকসান বুঝি। এবং যিনি আমাকে পানাহার করান। আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং তিনি আমাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে জীবিত করবেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন বলে আমি আশা করি। (আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব গুণের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহ্র ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে মুনাজাত শুরু করে দিলেনঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ইল্ম ও আমলে পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, মূল প্রজ্ঞা তো দোয়ার সময়ও অর্জিত ছিল)। এবং (নৈকট্যের স্তরে) আমাকে (উচ্চ স্তরের) সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর (অর্থাৎ মহান পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখ (যাতে তারা আমার পথে চলে। ফলে আমি বেশি সওয়াব পাব।) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারিগণের শামিল কর এবং আমার পিতাকে (ঈমানের তওফীক দিয়ে) ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম। যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে, সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোম-হর্ষক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) সেদিন (মুক্তির জন্য) অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে (সে মুক্তি পাবে,) যে (কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র নিকট আসবে এবং (সেদিন) আল্লাহ্ভীরুদের (অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে (যাতে তারা দেখে এবং তারা তথায় যাবে জেনে আনন্দিত হয়।) এবং পথভ্রষ্টদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য দোযখ সম্মুখে প্রকাশ করা হবে (যাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে দুঃখিত হয়) এবং (সেদিন) তাদেরকে (পথভ্রষ্টদেরকে) বলা হবে, আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা আত্মরক্ষা করতে পারে? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে) ও পথভ্রষ্ট লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (সুতরাং প্রতিমা ও শয়তানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাঁচাতে

পারবে না)। কাফিররা জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদেরকে) বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে তো (গোমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুষ্কর্মীরাই গোমরাহ্ করেছিল। অতএব (এখন) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (যে ছাড়িয়ে নেবে) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই (যে কেবল মর্মবেদনাই প্রকাশ করবে।) যদি আমরা (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম। [এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য সমাপ্ত হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ] নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যান্বেষী ও পরিণামদর্শীদের জন্য) শিক্ষা রয়েছে। (বিতর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে তওহীদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং কিয়ামতের ঘটনাবলী থেকে ভয় অর্জিত হয় এবং ঈমানের পথ প্রশস্ত হয়।) কিন্তু তাদের (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়াঃ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ —এই আয়াতে لسان বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ্, আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে। —(ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদী, খৃস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহিমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধঃ যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছেঃ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ

لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ——আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালবাসা এবং দুই. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বোঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোন গোনাহ্ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে ঃ اللهم اجعلنى فى عينى صغيرا وفى اعين الناس كبيرا হে আল্লাহ্, আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয। ইমাম গাযযালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এক. যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়, বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। দুই. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। তিন যদি তা অর্জন করার জন্য কোন গোনাহ্ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয়ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ অন্যত্র কোরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মু'মিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কামনা করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েয; যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াবঃ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ —এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবূল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ —অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানসন্ততি কারও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে।

এই আয়াতের استثناء কে استثناء منقطع সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারও অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের استثناء متصل টি এবং অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে---কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে ولا بنون বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم---এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কলেমায়ে তওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফিরের অন্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে: আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মু'মিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের

ময়দান ও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-দের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—وَٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎবান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মু'মিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মু'মিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না; যেমন হযরত নূহ (আ)-র পুত্র, লূত (আ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে—

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ — إِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ — وَاللهُ أَعْلَمُ এবং

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَٱتَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٤﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٦﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٨﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي
وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ
مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٣﴾

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা? (১১২) নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেওয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! (১১৪) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' (১১৬) তারা বলল, 'হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।' (১১৭) নূহ বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন।' (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সংগীগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (কেননা একজনকে মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল)। যখন তাদের জাতিভাই নূহ (আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের

বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (আল্লাহ্‌র পয়গাম কম-বেশি না করে হুবহু তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোন (পার্থিব) প্রতিদান (ও) চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। অতএব (আমার এই নিঃস্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা তোমার সংগী হয়ে আছে। (তাদের সাথে একাত্মতায় ভদ্রজনেরা লজ্জাবোধ করে। এছাড়া এমন হীনবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সংগী হয়ে থাকে। অতএব তাদের ঈমানের দাবি ধর্তব্য নয়।) নূহ (আ) বললেন, তারা (পেশাগতভাবে) কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (ভদ্র হোক কিংবা ইতর, ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া? তাদের ঈমান আন্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমার পালনকর্তারই কাজ। কি চমৎকার হত, যদি তোমরা তা বুঝতে! (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা সাব্যস্ত করার কারণে ইঙ্গিতে এই আবেদন বোঝা যায় যে, আমি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব এই যে) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (তোমরা ঈমান আন বা না আন, আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমি কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (প্রচারকার্য দ্বারা আমার কর্তব্য সমাধা হয়ে যায়। নিজেদের লাভ-লোকসান তোমরা দেখে নাও।) তারা বলল, হে নূহ, যদি তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে। (মোটকথা, যখন বছরের পর বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) নূহ (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে (সর্বদা) মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) মীমাংসা করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত করুন।) এবং আমাকে ও আমার সংগী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন। আমি (তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং) তাকে ও তাঁর সাথে যারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে আমি নিমজ্জিত করলাম। এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়ও) বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত

নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জাতব্য ঃ এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কেবল রসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র—পরিবার ও জাঁকজমক নয় ঃ

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ○ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

—এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল, বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চারিত্রের ওপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না।—(কুরতুবী)

كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ
اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا
بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا

الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَجَنّٰتٍ وَّ
عُيُوْنٍ ﴿١٣٥﴾ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٦﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ
عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٧﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٨﴾
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٩﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا
كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤١﴾

(১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরনা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের (জাতি) ভাই হুদ (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ প্রচারকার্যের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহংকার ও গর্বে এতটুকু লিপ্ত যে) প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছ (যাতে খুব উঁচু

দৃষ্টিগোচর হয়)। যাকে শুধুমাত্র অযথা (অপ্রয়োজনে) তৈরী করে থাক এবং (এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বসবাসের গৃহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর যে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ (অথচ এর চাইতে নিম্নস্তরের গৃহেও আরাম পেতে পার) এই ভেবে যে, দুনিয়াতে তোমরা চিরকাল থাকবে (অর্থাৎ সুবিশাল গৃহ, সুউচ্চ প্রাসাদ ও সুরম্য স্মৃতিসৌধ তখনই উপযুক্ত হত, যখন দুনিয়াতে তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হত। তখন তোমরা ভাবতে পারতে যে, প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংকীর্ণতা অনুভব না করে। কেননা, তারাও আমাদের সাথে এখানে থাকবে এবং এগুলো উচ্চতা-বিশিষ্টভাবেও নির্মাণ করতে হবে, যাতে নীচে স্থান সংকুলান না হলে ওপরে বসবাস করা যায় এবং মজবুতও করতে হবে, যাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, যাতে আমাদের চর্চা চিরকাল অব্যাহত থাকে। এখন তো সবই অযথা। সুরম্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছে। কেউ ত্বরায় এবং কেউ বিলম্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে তোমরা মনে এত কঠোরতা ও নির্দয়তা পোষণ কর যে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন স্বৈরাচারী (ও জালিম) হয়ে আঘাত হান। (এসব মন্দ চরিত্র বর্ণনা করার কারণ এই যে, মন্দ চরিত্র অনেক সময় ঈমান ও আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।) অতএব (শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং শাস্তির কারণ, তাই) আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (যেহেতু আমি রসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান (অর্থাৎ) চতুষ্পদ জন্তু, পুত্রসন্তান, উদ্যান ও ঝরনা তোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুগ্রহদাতার নির্দেশাবলী লংঘন করা মোটেই সমীচীন নয়)। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হও, তবে) এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ হচ্ছে ভীতি প্রদান এবং أمدكم এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় সমান—তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় অবস্থাতেই আমাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপুরুষদের একটি (সাধারণ) অভ্যাস (ও প্রথা। প্রতি যুগেই মানুষ নবুয়ত দাবি করে অন্যদেরকে এসব কথা বলে।) এবং (তুমি যে আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, শোন) আমরা কখনও আযাবপ্রাপ্ত হব না। মোটকথা, তারা হুদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং আমি তাদেরকে (ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার আযাব দ্বারা) নিপাত করে দিলাম। নিশ্চয় এতে (ও) বড় নিদর্শন আছে (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়, আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আযাব দিতে সক্ষম; কিন্তু দয়াবশত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝—ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, رِيْع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে-আব্বাস ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِيْعُ النَّبَاتِ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। اٰيَةً-এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِع শব্দটি مَصْنَع--এর বহুবচন। হযরত কাতাদাহ বলেন مَصَانِع বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تَشْبِيْه অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ—অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে!—(রূহুল মা'আনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাসের জবানী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই—النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ—অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—اَنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ اِلَّا مَا لَا يَعْنِىْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ অর্থাৎ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ; কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي
مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا
هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

(১৪১) সামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বলছেন, 'তোমরা কি ভয় কর না? (১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমা লংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।' (১৫৩) তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।' (১৫৫) সালেহ্ বললেন, 'এই উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা---নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কেন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে।

(১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সামূদ সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। (তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে আল্লাহ্ থেকে অত্যন্ত গাফিল, অতএব) তোমাদেরকে কি এসব বস্তুর মধ্যেই নিবিঘ্নে থাকতে দেয়া হবে? অর্থাৎ উদ্যানসমূহের মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (অর্থাৎ যে খেজুর বাগানে প্রচুর ফল আসে।) এবং (এই গাফিলতির কারণেই) তোমরা কি পাহাড় কেটে কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ? অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না (এখানে কাফির সরদারদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। 'অনর্থ করা ও শান্তি স্থাপন না করা' বলে তাই বোঝানো হয়েছে।) তারা বলল তোমার ওপর কেউ বড় যাদু করেছে। (ফলে বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবুয়ত দাবি করছ। অথচ) তুমি তো আমাদের মত একজন (সাধারণ) মানুষ। (মানুষ নবী হয় না।) অতএব তুমি যদি (নবুয়তের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মু'জিযা উপস্থিত কর। সালেহ (আ) বললেন, এই যে উষ্ট্রী (অস্বাভাবিক পন্থায় জন্মগ্রহণের কারণে এটা মু'জিযা, যেমন অষ্টম পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এর কিছু প্রাপ্য আছে। এক এই যে) পানি পান করার নির্ধারিত এক পালা এর এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে এক পালা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্তুদের। দুই—এই যে), তোমরা এর অনিষ্ট (এবং কষ্ট প্রদানের) উদ্দেশ্যে হাতও লাগাবে না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসে আযাব পাকড়াও করবে। অতঃপর তারা (রিসালতও মানল না এবং উষ্ট্রীর প্রাপ্যও আদায় করল না; বরং) উষ্ট্রীকে বধ করল। এরপর (যখন আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেল, তখন দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। (কিন্তু প্রথমত, আযাব দেখার পর অনুতাপ নিষ্ফল. দ্বিতীয়ত, নিছক অনুতাপে কিছু হয় না, যে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন প্রতিকার অর্থাৎ তওবা ও ঈমান না হয়।) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবকাশ দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ——হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে فَارِهِيْنَ--এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ্ ও ইমাম রাগিবের মতে فَارِهِيْنَ--এর তফসীর حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয়ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দ্বারা যদি গোনাহ্, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾
اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ
اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَ
اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَ
اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاۗءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا
كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

---

(১৬০) লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না ? (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (১৬৭) তারা বলল, 'হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।' (১৬৮) লূত বললেন, 'আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।' (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লূতের সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের ভাই লূত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি শুধু এ আচরণ কর যে, পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকাণ্ড আর কেউ করে না। এরূপ নয় যে, এটা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে;) বরং (আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বলল, হে লূত, তুমি যদি (আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (জনপদ থেকে) বহিষ্কার করা হবে। লূত (আ) বললেন, (আমি এই হুমকিতে বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি (কাজেই বলা-কওয়া কিরূপে ত্যাগ করব? তারা যখন কিছুতেই মানল না এবং আযাব আসবে বলে মনে হল. তখন) লূত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার (বিশেষ) পরিবারবর্গকে তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের বিপদ) থেকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম একজন বৃদ্ধা ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [লূত (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়া] অন্য সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। আমি তাদের ওপর বিশেষ প্রকারের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হল তাদের

ওপর, যাদেরকে (আল্লাহ্‌র আযাবের) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল! নিশ্চয় এতে (ও) শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের), অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারতেন; কিন্তু এখনও দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম ঃ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ—আয়াতের مِنْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تَبْعِيْض এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نعوذ بالله منه—(রূহুল মা'আনী)

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ—এখানে عَجُوز বলে লূত (আ)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। লূত (আ)-এর এই কাফির স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য عَجُوز শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে عَجُوز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ—এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয। হানাফী আলিমদের মাযহাব তাই। কেননা লূত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।—(শামী ঃ কিতাবুল হুদূদ)

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا
مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾
فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

(১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন শু'আয়ব তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা---তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও। (১৮৮) শু'আয়ব বললেন, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত।

(১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব। (১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে,; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আসহাবে আইকা (ও, যাদের কথা সূরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শু'আয়ব (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং (প্রাপকের) ক্ষতি করবে না। (এমনিভাবে ওজনের বস্তুসমূহে) সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে না। তোমরা তাঁকে (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তোমার ওপর তো কেউ বড় আকারের যাদু করেছে (ফলে তোমার মতিভ্রম হয়ে গেছে এবং তুমি নবুয়ত দাবী করতে শুরু করেছ)। তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমরা মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আসমানের কোন টুকরা ফেলে দাও (যাতে আমরা জানতে পারি যে, তুমি বাস্তবিকই পয়গম্বর ছিলে এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শাস্তি হয়েছে)। শু'আয়ব (আ) বললেন, (আমি আযাব আনয়নকারী অথবা তার অবস্থা নির্ধারণকারী নই,) তোমাদের ক্রিয়াকর্ম আমার পালনকর্তা (ই) ভাল জানেন। (এই ক্রিয়াকর্মের কারণে কি আযাব হওয়া দরকার, কবে হওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন। সব তাঁরই ইচ্ছা।) অতপর তারা (হরহামেশাই) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চিতই সেটা ভীষণ দিবসের আযাব ছিল। এতে (ও) বড় শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ—কারও কারও মতে قسط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قسط থেকে উদ্ভূত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ---অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেওয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারূক (রা) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত উমর (রা) বললেন, طففت অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালিক বলেন ঃ وفاء وتطفيف অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কারও হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না কেন---হারাম। ويل للمطففين আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে---গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না ঃ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ---এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের ওপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল।---(রূহুল মা'আনী)

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ
لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا

كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٥٩﴾
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿١٦٠﴾ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً
وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٦١﴾ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾ اَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٦٣﴾ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿١٦٤﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا
يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦٥﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿١٦٦﴾ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿١٦٧﴾ ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿١٦٩﴾
وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿١٧٠﴾ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿١٧١﴾
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ
الْاَقْرَبِيْنَ ﴿١٧٣﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ فَاِنْ
عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٧٥﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿١٧٦﴾
الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿١٧٧﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿١٧٨﴾ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿١٧٩﴾ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿١٨٠﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ
اَثِيْمٍ ﴿١٨١﴾ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ
الْغَاوٗنَ ﴿١٨٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿١٨٤﴾ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ
مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٨٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ
كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۭ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿١٨٦﴾

(১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে

আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলিমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব; (২০২) অতপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল (২০৯) স্মরণ করানোর জন্য, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করে নি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন। (২১৬) যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর ওপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন। (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহ্গারের ওপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কোরআন বিশ্বপালনকর্তা প্রেরিত। একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগমন করেছে আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন তাঁদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্র

নির্দেশাবলী পৌঁছিয়েছেন, আপনিও তেমন পৌঁছান।) এবং এর (কোরআনের) উল্লেখ পূর্ববর্তীগণের (আসমানী) কিতাবে (ও) আছে (যে, এরূপ গুণসম্পন্ন পয়গম্বর হবেন, তাঁর প্রতি এরূপ কালাম নাযিল হবে। এ স্থলে তফসীরে হাক্কানীর টীকায় পূর্ববর্তী কিতাব তওরাত ও ইন্‌জীলের কতিপয় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীকে) বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতরা জানে। (সেমতে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এর স্বীকারোক্তি করে। প্রথম পারার চতুর্থাংশে أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ আয়াতের তফসীরে একথা বিবৃত হয়েছে। এই প্রমাণটি অশিক্ষিত আরবদের জন্য। নতুবা শিক্ষিত লোকেরা আসল কিতাবেই তা দেখে নিতে পারত। এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা, পরিবর্তন সত্ত্বেও এরূপ বিষয়বস্তু বাকী থেকে যাওয়া আরও অধিকতর প্রমাণ। পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে একথা বলা ভুল। কেননা, নিজের ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে না। এসব বিষয়বস্তু পরিবর্তনকারীদের জন্য যে ক্ষতিকর তা তো স্পষ্ট। এ পর্যন্ত وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ দাবির দুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হল অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উল্লেখ এবং বনী ইসরাঈলের জানা থাকা। এগুলোর মধ্যেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতপর অবিশ্বাসকারীদের হঠকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দাবির যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অলৌকিকতা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন হঠকারী যে,) যদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি এই কোরআন কোন আজমী (অনারব) ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতপর তিনি তাদের সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে এর মু'জিযা হওয়া আরও বেশি প্রকাশ পায়; কেননা, যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ)। তখনও তারা (চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য তাদের বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ] এমনিভাবে আমি অবাধ্যদের অন্তরে (এই তীব্র) অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (এই তীব্রতার কারণে) তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (মৃত্যুর সময় অথবা বরযখে অথবা পরকালে) প্রত্যক্ষ না করে, যা আকস্মিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর আশংকা দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনরূপে) অবকাশ পেতে পারি? কিন্তু সেটা অবকাশ ও ঈমান কবুল হওয়ার সময় নয়। কাফিররা আযাবের বিষয়বস্তু শুনে অবিশ্বাসের স্থলে আযাব চাইত এবং বলত, وَإِن كَانَ এবং رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا

هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ---অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা অবকাশকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবর্তী আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা কি (আমার সতর্কবাণী শুনে) আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? (এর আসল কারণ অবিশ্বাস। অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর সত্ত্বেও তারা অবিশ্বাস করে? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল। (কেননা) হে সম্বোধিত ব্যক্তি, বলুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দেই, অতঃপর তাদেরকে যার (অর্থাৎ যে আযাবের) ওয়াদা দেওয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কি উপকারে আসবে? অর্থাৎ ভোগবিলাসের এই অবকাশের কারণে তাদের আযাব কোনরূপ হালকা অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না)। আর (হেকমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া তাদের জন্যই নয়; বরং পূর্ববর্তী উম্মতরাও অবকাশ পেয়েছে। সেমতে অবিশ্বাসীদের) যত জনপদ আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের জন্য সতর্ককারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন। (যখন তারা মান্য করেনি, তখন আযাব নাযিল হয়েছে।) আমি (দৃশ্যতও) জুলুমকারী নই। (উদ্দেশ্য এই যে, দলীল সম্পূর্ণ করা এবং ওযরের পথ বন্ধ করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ সবার জন্যই ছিল। পয়গম্বরদের আগমনও এক প্রকার অবকাশ দেওয়াই। কিন্তু এরপরও ধ্বংসের আযাব এসেছেই। এসব ঘটনা থেকে অবকাশ দানের রহস্যও জানা গেল এবং অবকাশ ও আযাবের মধ্যে বৈপরীত্য না থাকাও প্রমাণিত হল। 'দৃশ্যত' বলার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই জুলুম হয় না। অতপর আবার وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ -এর বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপযোগী হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের সারমর্ম কোরআনের সত্যতা সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করা। প্রথমত কোরআন আল্লাহ্র কালাম এবং তাঁর প্রেরিত---এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক বিদ্যমান ছিল। তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। নাউযুবিল্লাহ্, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কেও কোন কোন কাফির অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত। (দুররে মনসূর-ইবনে মায়দ থেকে বর্ণিত) বুখারীতে জনৈকা মহিলার উক্তি বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ওহীর আগমনে বিলম্ব দেখে সে বলল, তাঁকে তাঁর শয়তান পরিত্যাগ করেছে। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা যা কিছু বলত, তা শয়তানেরই শিক্ষার ফল ছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এই কোরআন বিশ্বজাহানের পালনকর্তার অবতীর্ণ)। একে শয়তানরা (যারা অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে আগমন করে)

অবতীর্ণ করেনি। (কেননা, শয়তানের দুইটি শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে। প্রথমত তার শয়তানী গুণ, যার কারণে) এটা (অর্থাৎ কোরআন) তাদের উপযুক্তই নয়। (কেননা, কোরআন পুরোপুরিই হিদায়ত এবং শয়তান পুরোপুরিই পথভ্রষ্টতা। শয়তানের মস্তিষ্কে এ ধরনের বিষয়বস্তু আসতেই পারে না এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সফল হতে পারে না। দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে,) তারা (শয়তানরা) এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে (ওহী) শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সেমতে অতীন্দ্রিয়বাদী ও মুশরিক-দের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। এরপর মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বুখারীতে হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা দেয়ার কোন সম্ভাবনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিষ্টাংশ এবং অপর একটি সন্দেহের জওয়াব সূরার শেষভাগে বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার শাখা হিসেবে একটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, যখন প্রমাণিত হল এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তওহীদ।) অতএব (হে পয়গম্বর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কাছে তওহীদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সম্বোধন করে বলছি,) আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শাস্তি ভোগ করবেন। (অথচ নাউযুবিল্লাহ্, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে শিরক ও শাস্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে এর মাধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যও শাস্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের কোন কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক করে শাস্তির কবল থেকে কিরূপে বাঁচতে পারবে? (এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে) আপনি (সর্বপ্রথম) আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক করুন। (সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিলেন। অতঃপর নবুয়তের দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আপনার অনুসারী মু'মিন, তাদের প্রতি বিনয়ী হোন (তারা পরিবারভুক্ত হোক কিংবা পরিবারবহির্ভূত)। যদি তারা (যাদের-কে আপনি সতর্ক করেছেন) আপনার অবাধ্যতা করে (কুফরকে আঁকড়ে থাকে), তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তার জন্য আমি দায়ী নই। (اخفض ও قل—এই দুইটি আদেশসূচক বাক্যে) 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' এবং 'আল্লাহর জন্য শত্রুতার পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা করবেন না।) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র ওপর ভরসা করুন, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দণ্ডায়মান হন এবং (নামায শুরুর পর) নামাযীদের সাথে ওঠাবসা করেন। (নামায ছাড়াও তিনি আপনার দেখাশোনা করেন। কেননা,)

তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সুতরাং আল্লাহ্‌র জ্ঞানও পূর্ণ, যেমন سَمِيعٌ এবং يَرَاكَ ও عَلِيمٌ থেকে জানা যায়। তিনি আপনার প্রতি দয়ালুও, যেমন اَلرَّحِيمُ থেকে বোঝা যায় এবং তিনি সব কিছুর উপর সামর্থ্যবানও, যেমন اَلْعَزِيزُ থেকে অনুমিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকারীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্যত। এর অধীনে হাজারো উপকার নিহিত থাকে, যেগুলো কোন সময় দুনিয়াতে এবং কোন সময় পরকালে প্রকাশ পায়। এরপর অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াবের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে পয়গম্বর, লোকদেরকে বলে দিন,) আমি তোমাকে বলব কি, কার উপর শয়তানরা অবতরণ করে? (শোন,) তারা অবতীর্ণ হয় এমন লোকদের উপর, যারা (পূর্ব থেকে) মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র এবং যারা (শয়তানদের বলার সময় তাদের দিকে) কান পাতে এবং (মানুষের কাছে সেসব বিষয় বর্ণনা করার সময়) তারা প্রচুর মিথ্যা বলে। (সেমতে নিম্ন স্তরের আমেলদেরকে এখনও এরূপ দেখা যায়। এর কারণ এই যে, উপকারগ্রহিতা ও উপকারদাতার মধ্যে মিল থাকা অত্যাবশ্যক। সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি হবে, যে মিথ্যাবাদী ও গোনাহ্‌গার। এছাড়া শয়তানের দিকে সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশও করতে হবে। কারণ, মনোনিবেশ ব্যতীত উপকার লাভ করা যায় না। শয়তানের অধিকাংশ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাবপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রান্তস্থিত টীকা-টিপ্পনীও অনুমান দ্বারা সংযোজিত করতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য স্বভাবতই এটা জরুরী। রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও নেই। কেননা, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই জানা ছিল। তিনি যে পরহিযগার ও শয়তানের দুশমন ছিলেন, তা শত্রুরাও স্বীকার করত। অতএব তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন কিরূপে? এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবি হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন যেমন কাফিররা বলত, بَلْ هُوَ شَاعِرٌ—অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছন্দযুক্ত না হলেও কাল্পনিক ও অবাস্তব। এ ধারণা এ জন্য ভ্রান্ত যে) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের পথ অনুসরণ করে। ('পথ' বলে কাব্যচর্চা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কবিসুলভ কাল্পনিক বিষয়বস্তু গদ্যে অথবা পদ্যে বলা তাদের কাজ, যারা সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে। এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,) তুমি কি জান না যে, তারা (কবিরা কাল্পনিক বিষয়বস্তুর প্রতি) ময়দানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে (বিষয়বস্তুর খোঁজে) ঘোরাফেরা করে এবং (যখন বিষয়বস্তু পেয়ে যায়, তখন অধিকাংশই বাস্তবতাবর্জিত হওয়ার কারণে)

এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (সেমতে কবিদের প্রলাপোক্তির একটি নমুনা লেখা হল ঃ

اے رشک مسیحا تری رفتار کے قربان
ٹھوکر سے مری لاش کئی بار جلا دی
اے باد صبا ہم تجھے کیا یاد کرینگے
اس گل کی خبر تونے کبھی ہم کو نہ لا دی

আরও----

صبا نے اسکے کوچے سے اڑا کر
خدا جانے ہماری خاک کیا کی

এমনকি, তারা মাঝে মাঝে কুফরী কথাবার্তা বকতেও শুরু করে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, কবিতার বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও অবাস্তব হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে কোরআনের বিষয়বস্তু যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক—সবই বাস্তবসম্মত ও অকল্পিত। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলা কবিসুলভ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। পদ্যে যেহেতু অধিকাংশই এ ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পায়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছন্দ রচনার সামর্থ্যও দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রকম নয়। কোন কোন কবিতায় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সত্যানুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে কবিদের নিন্দার আওতায় সব কবিই এসে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ) তবে তাদের কথা ভিন্ন, (কবিদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ শরীয়তের বিরুদ্ধে কথাও বলে না, কাজও করে না। তাদের কবিতায় বাজে বিষয়বস্তু স্থান পায় না)। এবং তারা (তাদের কবিতায়) আল্লাহ্কে খুব স্মরণ করে (অর্থাৎ তাদের কবিতা ধর্মের সমর্থন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত। এসব কাজ আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত)। এবং (যদি কোন কবিতায় কারও কুৎসার মত বাহ্যত চরিত্রবিরোধী কোন অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই যে,) তারা উৎপীড়িত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট দিয়েছে, যেমন তাদের কুৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, যা ব্যক্তিগত কুৎসার চাইতেও অধিক কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান কিংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। এ ধরনের কবিগণ ব্যতিক্রমভুক্ত। কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক আনুগত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পর্যন্ত রিসালত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব পূর্ণ হল। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা রিসালত প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এতদসত্ত্বেও যারা নবুয়ত অস্বীকার করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। অর্থাৎ) যারা (আল্লাহ্র হক, রসূলের হক অথবা

বান্দার হকে) জুলুম করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, কিরূপ (মন্দ ও বিপদের) জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ० عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ०
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ० وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ०

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না। وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা انه এর সর্বনামটি বাহ্যত কোরআনকে বোঝায়। زبر শব্দটি زبور -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইন্‌জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাক হাকিমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে সূরা বাকারা "প্রথম আলোচনা" থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طس দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حم দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আ)-র ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুল্‌ক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ—

—অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-র সহিফাসমূহেও আছে।

সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নাম নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ - তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ ঃ এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' বলা জায়েয নয় ঃ এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন' ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কোরআন' বলে দেয়। এটা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 'কোরআন' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয।

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ—এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ—এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন—

نهارك بالغرور سهو وغفلة
وليلك نوم والردى لك لازم
فلا انت فى الايقاظ يقظان حازم
ولا انت فى النوم ناج وسالم
وتسعى الى ما سوف تكره غبة
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم

অর্থাৎ---তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ—عشيرة শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসূলুল্লাহ্ (স)-র ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবূল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায়। এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পেঁৗছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا—অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবার-বর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও

চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জাতিগোষ্ঠি যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহ্ (স) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ---অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গযলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهٖ---شَاعِرٌ مَّجْنُونٌ---بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফিররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كاذب তথা মিথ্যাবাদীকে شاعر বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ—আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত—(ফতহুল বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়ায ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে ঃ إن من الشعر حكمة অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।—(বুখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে 'হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবূ সলতের

একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। (৪) ইমাম বুখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) কবিতা বলতেন। (৫) আবূ ইয়ালা ইবনে উমর থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।—(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জ্ঞান-গরিমায় সেরা ফিকাহ্‌বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেন নি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেন নি কিংবা শোনেন নি ও পছন্দ করেন নি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন ঃ

لان يمتلى جوف رجل قيحا يريه خير من ان يمتلى شعرا —অর্থাৎ পুঁজ দ্বারা পেটভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্‌র স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত উমর (রা) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় ঃ ইবনে আবী জমরাহ্ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

প্রায় ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হয়ে যায় ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ—এই আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হল অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা হল? এর কারণ এই যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গোনাহ্ স্বয়ং অনুসৃতের গোনাহ্র আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্মগত ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলিমের পথভ্রষ্টতার দলীল হবে না। واللهُ اعلم

سورة النمل

সূরা আন-নাম্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ هُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ
يَعْمَهُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ
الْاَخْسَرُوْنَ ۙ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۙ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু।

(১) ত্বা-সীন ; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের ; (২) মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্য রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্বা-সীন (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন), এগুলো কোরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশক ও (এই পথপ্রাপ্তির ফলে) সুপ্রতিদানের সুসংবাদদাতা ; যারা (মুসলমান) এমন যে, (কার্যক্ষেত্রেও হিদায়ত অনুসরণ করে চলে। সেমতে) নামায কায়েম করে (যা দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও হিদায়তপ্রাপ্ত। সেমতে) পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (এ হচ্ছে মু'মিনদের

গুণাবলী এবং) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দূরে) উদ্‌-ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (তাদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোর-আনও মানে না। কোরআন মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ শুনায়, তেমনি অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে যে,) তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াতে মৃত্যুর সময়ও) কঠিন শাস্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত (কোন সময় মুক্তি পাবে না। অবিশ্বাসীরা কোরআন না মানলেও) নিশ্চয়ই আপনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোরআন লাভ করেন (এই নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ—অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে أَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট-তার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন—

زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ-زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম; যেমন—حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ—দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত أَعْمَالَهُمْ (তাদের কর্ম) শব্দও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম—সৎকর্ম নয়।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ
أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨
يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ ۖ
إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا
بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝١٢ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ۝١٣ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝١٤

(৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।' অতপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। 'হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে সে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে; নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে লুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।' এগুলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল---এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন) যখন (মাদইয়ান থেকে ফিরার পথে রাত্রিকালে তূর পাহাড়ের নিকটে পৌঁছেন এবং মিসরের পথও ভুলে যান, তখন) মূসা (আ) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (তূর পাহাড়ের দিকে) আগুন দেখেছি। আমি এখনই (সেখে) সেখান থেকে (হয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান থেকে) আগুনের জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অতপর যখন তার (আগুনের) কাছে পৌঁছলেন, তখন তাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আওয়াজ দেওয়া হল, যারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা) এবং যারা এই আগুনের পার্শ্বে আছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [অভিবাদন ও সালামের স্থলে এই দোয়া করা হয়েছে; যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরস্পরে সালাম করে। মূসা (আ) জানতেন না যে, এটা আল্লাহ্‌র নূর, তাই তিনি সালাম করেননি। তাঁর মনসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম করা হল। ফেরেশতাগণকে যুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যের আলামত হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মূসা (আ)-র বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ হয়ে গেছে। আগুনাকারের এই নূর যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার জন্য অতপর বলা হয়েছে,] বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত হওয়া থেকে) পবিত্র। [এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতরাং এই নূর আল্লাহ্‌র সত্তা নয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে মূসা (আ) পূর্বে অজ্ঞাত থাকলে এটা তাঁর জন্য শিক্ষা। আর যদি যুক্তি ও বিশুদ্ধ স্বভাবধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা অতিরিক্ত বোধানো। এরপর বলা হয়েছে:] হে মূসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় কথা বলছি) আমি আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হে মূসা) তুমি তোমার লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর হয়ে দুলতে লাগল)। অতপর যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। (বলা হল,) হে মূসা, ভয় করো না (কেননা আমি তোমাকে পয়গম্বরী দিয়েছি)। আমার কাছে পয়গম্বরগণ (পয়গম্বরীর প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা দেখে) ভয় করে না, (কাজেই তুমিও ভয় করো না)। তবে যার দ্বারা কোন ত্রুটি (পদস্খলন) হয়ে যায় (এবং সে এই পদস্খলন স্মরণ করে ভয় করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে, যদি ত্রুটি হয়ে যায়) এবং ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর ত্রুটির পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তওবা করে,) তবে আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (এটা এজন্য বলেছেন, যাতে লাঠির মু'জিযার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবার কোন সময় কিবতী হত্যার ঘটনা স্মরণ করে পেরেশান না হয়। হে মূসা, লাঠির এই মু'জিযা ছাড়া আরও একটি মু'জিযা দেওয়া হচ্ছে, তা এই যে,) তুমি তোমার হাত বগলে ঢুকিয়ে দাও (অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষত্রুটি ছাড়াই (অর্থাৎ ধবল

কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই অত্যন্ত) সুশুভ্র বের হয়ে আসবে। এগুলো (এই উভয় মু'জিযা) সেই নয়টি মু'জিযার অন্যতম, যেগুলো (দিয়ে) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি (তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে)। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। যখন তাদের কাছে আমার (দেওয়া) উজ্জ্বল মু'জিযা পৌঁছল (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় দুই মু'জিযা দেখানো হয়। এরপর সময়ে সময়ে অন্যান্য মু'জিযাও দেখানো হয়।) তখন তারা (এগুলো দেখে) বলল, এ তো প্রকাশ্য যাদু। (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও অহংকার করে মু'জিযাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অথচ (ভিতর থেকে) তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের কি (মন্দ) পরিণাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আগুনে পোড়ার শাস্তি পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ মূসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত—পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। —(রূহুল মা'আনী)।

এ স্থলে হযরত মূসা (আ) تَصْطَلُونَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম ঃ আয়াতে قَالَ مُوسٰى لِاَهْلِهٖ বলা হয়েছে। اَهْل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-র সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - يٰمُوْسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

মূসা (আ)-র আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ ঃ মূসা (আ)-র এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তা সাপেক্ষ—প্রথম بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং দ্বিতীয় اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে—اِذْ رَاٰى نَارًا থেকে

نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ -

এসব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ এবং দ্বিতীয় اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ—সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

এই সূরাত্রয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ)-র অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শুনা গেল—إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ—إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ—إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا—এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে—একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীতে আবূ হাইয়ান এবং রূহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলূসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে—শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মু'জিযা বিশেষ।

এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো! কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللَّهِ শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا এবং সূরা কাসাসে أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে।

এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ্ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে:-أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারকদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে-রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ

দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, مَنْ فِى النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যি-কার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মূসা (আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, مَنْ فِى النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্তিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-র একটি রেওয়ায়েত ও তার পর্যালোচনা ঃ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে مَنْ فِى النَّارِ এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَنْ فِى النَّارِ বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণ ঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না—তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তজল্লী' তথা জ্যোতির্বিকীরণও বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তজল্লী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার তজল্লী ছিল না। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা মূসা (আ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْكَ—হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে لَنْ تَرَانِى বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতির্বিকীরণ বোঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমন সত্তার তজল্লীও ছিল না। বরং لَنْ تَرَانِى উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ্ তা'আলার

সত্তাগত তজল্লী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তজল্লীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তজল্লী ছিল, যা সূফী —বুযুর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ -এর পূর্বের আয়াতে মূসা (আ)-র লাঠির মু'জিযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা (আ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মূসা (আ)-র দ্বিতীয় মু'জিযা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা استثناء منقطع, না متصل —এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে منقطع সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহ্র কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে استثناء متصل সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ সগিরা গোনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিরা কোন প্রকার গোনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়-বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ)-র দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ)-র মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হত না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ
دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتّٰى إِذَا أَتَوْا عَلٰى وَادِ
النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰٓأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا
وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى
وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। (১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনা-বাহিনীকে সমবেত করা হল---জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ শাসনের) জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [দাউদ (আ)-এর ওফাতের পর] সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন (অর্থাৎ তিনি রাজত্ব লাভ করেন)। তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে) বললেন, হে লোকসকল।

আমাকে বিহংগকুলের বুলি শিক্ষা দেয়া হয়েছে (যা অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্কে শিক্ষা দেয়া হয় নি) এবং আমাকে (রাজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই দেয়া হয়েছে (যেমন সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরাস্ত্র ইত্যাদি)। নিশ্চয় এটা (আল্লাহ্ তা'আলার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের (কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও আশ্চর্য ধরনের ছিল। সেমতে তাঁর) সামনে তাঁর (যে) বাহিনী সমবেত করা হল---(হয়েছিল, তাদের মধ্যে) জিন, মানব ও বিহংগকুল (-ও ছিল, যারা অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্র অনুগত হয় না। তারা ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে (চলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যেই স্বভাবত এরূপ করা হয়। কেননা, অল্প সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় সমাবেশ আগের লোকেরা পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। একবার তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে) বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। সুলায়মান (আ) তার কথা শুনে (আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারও এত সতর্কতা! তিনি) মুচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বুলি বুঝে ফেলার নিয়ামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও স্মরণ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [অর্থাৎ ঈমান ও জ্ঞান সবাইকে এবং নবুয়ত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ (আ)-কে।] এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎ কর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেন মকবুল হয়। কেননা, কর্ম সৎ হওয়ার পর যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে সেরূপ কর্ম উদ্দিষ্ট নয়।) এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) অন্তর্ভুক্ত করুন (অর্থাৎ নৈকট্যকে দূরত্বে পর্যবসিত না করুন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا—বলা বাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়; যেমন হযরত দাউদ (আ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়---জিন ও

জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উর্ধ্বে।---(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না ঃ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে---আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ--- نحن معا شر الا نبياء لا نورث ولا نورث অর্থাৎ পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে العلماء ورثة الا نبياء وان الا نبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر---অর্থাৎ আলিমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে---আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবূ আবদুল্লাহ্‌র রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সুলায়মান (আ)-এর উত্তরাধিকারী।---(রূহুল মা'আনী)। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।---(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী ছিল।---(কুরতুবী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েয ঃ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا الخ—হযরত সুলায়মান (আ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রসূত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়—অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান ঃ এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।—(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে منطق الطير অর্থাৎ বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন-না-কোন উপদেশ বাক্য।

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ—আভিধানিক দিক দিয়ে كل শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়; যেমন এখানে সেই সব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে ছিল না।

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ—এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা।

এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوزَعُونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ---এখানে রেযার অর্থ কবুল। অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবূল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎ কর্ম মকবূল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবূল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ---এতে বোঝা গেল যে, কোন সৎ কর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবূল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সৎ কর্ম মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না ঃ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ— সৎ কর্ম সম্পাদন এবং তা মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে।---(রূহুল মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন; অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদ্দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
(২০) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (২১)
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ

بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ
اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا
يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾
اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? না কি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎ পথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর? (২৬) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক।' (২৭) সুলায়মান বললেন, 'এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খোঁজ নিলেন, অতঃপর (হুদহুদকে না দেখে) বললেন, কি হল, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে